কোন উত্তরাধিকার আমরা বহন করব?

ইমানুল হক

আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১।
অলিভার ক্রমওয়েল-কে যখন জিজ্ঞেস করা করা হল: ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিরূপে আপনাকে গর্বের সঙ্গে প্রবেশ দেখার জন্য যে এতগুলো মানুষ ভিড় করেছে, তার জন্য কি আপনি গর্বিত বোধ করছেন না? তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, এরচেয়ে তিন গুণ বেশি লোক আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে দেখার জন্য ভিড় করবে।'

ফ্রয়েডকে তাঁর আকস্মিক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুনিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক রাজা অলিভার ক্রমওয়েল-এর এই বয়ান।
আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 'আজকাল' সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ইতিহাসের ফুটনোটেও জায়গা হবে না।
সেটা সত্যি কীনা ইতিহাস বলবে!

কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে এমন নির্মোহ মূল্যায়ন অন্তত ইতিহাসে থাকবে।

২।
কতটুকু চিনি নিজেদের? চিনি সময় ও ইতিহাস-কে?
কতটুকু সাক্ষ্য থাকবে আবহমানকালের সময় ধারায়?
তবু কত ঠুনকো অহঙ্কার আর আত্মম্ভরিতা, তোষামোদ আর বিজ্ঞাপনময়তা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়?
নিজেদের ছোট করে ক্ষমতার প্রতি তীব্র মমতায় নিজেরা নিজেদের বিপন্ন করি, ইতিহাসের কাছে!
অথচ ইতিহাস বড় নির্মম।
আলেকজান্ডার, শার্লেমোন থেকে শুরু করে তোজো মুসোলিনি হিটলার--
নেতিবাচক উদাহরণ হিসেবে মাঝে মাঝে সামনে আসে, বাকি সময় ডুবে যায় ইতিহাসের নরম অন্ধকারে।

৩।
খুব ভাল কিছু ও কি আমরা মনে রাখি প্রাত্যহিকতায়? রাখি না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার রা তো বিস্মৃতপ্রায় থেকে গেলেন। নবজাগরণ, বাংলা ভাষা চেতনা সমিতি-র

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

মত হাতে গোনা দু একটি সংগঠন ছাড়া সেভাবে স্মরণ করল না তাঁদের। স্মরণ যদি বা হল, তাঁদের কাজের অনুসরণ হল কই!
প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত কারখানা গড়া, ওষুধ আবিষ্কারের কাজ করছেন কজন? বা ডাক্তার নীলরতন রায়-রা যে মাতৃভাষা বাংলায় ডাক্তারি পড়ানোর জন্য বর্তমান আর জি কর মেডিকেল কলেজ গড়েছিলেন সেকথাই বা কজন মানুষ দূরে থাক, ডাক্তারি ছাত্র জানেন?

৪।
আজ ইংরেজ নেই। কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমের জন্য কি বিপুল কাঙালপনা।
অথচ ইংরেজ আমলে বাংলার কদর ছিল।
১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১-২২ জুন ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলায় ডাক্তারি পড়ানোর জন্য পরীক্ষা নেয়। পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর। তার আগে বাংলায় পড়ানোর জন্য 'ফার্মাকোপিয়া' অনুবাদ করায় ইংরেজ কোম্পানি, পাতা পিছু সেকালের দ' টাকা দিয়ে। অনুবাদক প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ খ্যাত মধুসূদন গুপ্ত। মোট ৭০০-র বেশি চিকিৎসাশাস্ত্রের বই অনুবাদ হয় ব্রিটিশ যুগে। গ্রে-র 'অ্যানাটমি'-র মত বই-ওঅনূদিত হয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন কলেজ পড়ানো শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান। ম্যাক সাহেব রচনা করেন 'কিমিয়াবিদ্যাসার'। বাংলায় ভূ-মানচিত্র তৈরি করেন গর্ডন সাহেব ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে।
আর আজ স্বাধীন ভারতে ইংরেজিতে পড়ার প্রবণতা বাড়ছে। বাংলায় নাকি বিজ্ঞান পড়ানো যায় না! প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলতেন যে, যাঁরা বলেন বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানো যায় না, তাঁরা বাংলাটাও জানেন না, বিজ্ঞানটাও বোঝেন না।
জগদীশচন্দ্র বসু, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বাংলা মাধ্যমে পড়েছেন। তিনি গর্বিত ছিলেন, তাঁর বাবা তাঁকে ব্রিটিশ আমলে বাংলা মাধ্যমে পড়িয়েছিলেন বলে। বাবা ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী। কিন্তু তাঁর কোনো হীনমন্যতা ছিল না।
সার্নে গবেষণার সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসু আবিষ্কৃত 'বোসন' কণার নাম আবার শোনা যাচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা মাধ্যমে পড়েছিলেন। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাও। ইদানীং কালে যে বাঙালি তথা ভারতীয় বিজ্ঞানী পৃথিবী বিখ্যাত সেই পদার্থবিদ অশোক সেন বাংলা মাধ্যমের ছাত্র। ইংরেজি মাধ্যম তো ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে পড়ানো হচ্ছে। কজন কৃতী ছাত্রের নাম করতে পারবেন, এই বাংলায়? বাঙালি ছাত্ররা কি সবু বেচুবাবু হবে, (সেলসম্যান) নাকি কম্পিউটার অপারেটর?
বিজ্ঞানী হবেন না কেউ? কৃতী চিকিৎসক? শল্পোদ্যোগী? কৃষিবিজ্ঞানী? উন্নত কৃষক?কৃষি ছাড়া সভ্যতা বাঁচবে? শুধু এই শপিংমল, ফ্যাশন শো, নাইট ক্লাব, পুকুর ঘাট সুলভ দলাদলি-র রাজনীতি কোন দিশা দেখাবে মানুষকে? বিদ্বেষ আর দোষারোপ ছাড়া যে রাজনীতি এক পা-ও এগোতে পারে না?
আর আমরা নাকি সভ্য? একুশ শতকের উন্নত মানুষ!
হায় সভ্যতা বা উন্নতি কাহাকে বলে?

৫।

উনিশ শতক বাঙালির সর্বস্ব--উনিশ শতক বাঙালির সর্বনাশ। অনেকে মনে করেন উনিশ শতক বাঙালির সেরা শতক। ভুল। উনিশ শতকে কিছু মনীষী আমরা পেয়েছি বঠে, কিন্তু হারিয়েছি অনেক।
বাংলার বস্ত্রশিল্প, সোরা শিল্প, পেতল কাঁসার তৈজস-পত্র নির্মাণ শিল্প ধ্বংস হয়েছে। অ্যাডামস সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন, বাংলায় এক লক্ষ পাঠশালা ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হাত ধরে তা বিলুপ্ত হয়েছে।
আর ব্রিটিশরা ১৫১ টা স্কুল খুলল। আমরা হাততালি দিতে ব্যস্ত হলাম।এক লাখের বদলে ১৫১। গণশিক্ষা ধ্বংস, আমরা চুপ। বিদ্যাসাগর ভাল কাজ করেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু, এক লাখ যে গেল!
গণশিক্ষা গেল, মানে বিজ্ঞান চিন্তা গেল। শুভংকরী গণিত মৃত হল। (আজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বই প্রকাশ করে বলছে, জমি মাপার জন্যপ 'কুড়ে-লিহ্যে' পদ্ধতি ভাল ছিল।) শ্রমিক-কারিগর ইংরেজদের অত্যাচারে পেটের দায়ে শিল্প ছেড়ে কৃষিতে গেল। বাংলা তো শুধু কৃষিনির্ভর ছিল না। শিল্পের জন্যও ছিল তাঁর বিশ্বখ্যাতি। কিন্তু সে কথা তোপ আমরা আজকাল কেউ বলি না। কথাসাহিত্যিকরাও কেউ লেখান না। কেবল ব্যতিক্রম, সমরেশ বসু। যে যাই বলুন, সমরেশ বসু তাঁর কমিউনিস্ট মতাদর্শ মনে রেখেছেন বহু লেখাতেই।
মসলিন, সোরা, বা পেতল কাঁসা শুধু নয়, নৌকা, মশলা, সোনা রুপোর কাজের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। বিদেশি বণিক তো এমনি এমনি বাংলায় আসেনি।
সিরাজের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধের মূল কারণ তো-অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরোধিতা।
সিরাজ চেয়েছিলেন ইংরাজরা শুল্ক দিয়ে বাণিজ্য করুক।
মিরকাশিম তো ইংরেজদের শুল্ক আদায় না করতে পেরে দেশি বণিকদের ও শুল্ক ছাড় দিয়ে দেন।

আজ কিছু নির্বাচিত দেশি ও বিদেশি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা করভারে পীড়িত। কিন্তু কে মুখ খুলবে তাঁদের হয়ে? পুঁজিপতিরা সরকার অনুদান ও সুবিধা পেয়ে ব্যবসা করে, আর সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানিতে ছাড় পায় না।

৬।

সহ্যের অসম্ভব পরীক্ষাগারে মধ্যবিত্ত মানুষ। ক্ষমতা বহুদিন ধরেই চোখ রাঙাচ্ছে। এ আজ নতুন নয়। গোষ্ঠীভুক্ত না হলে পড়বে বিপদে--এই মনোভাব গণতন্ত্রের শত্রু। অথচ এ অভ্যাস আশির দশকের মাঝ বরাবর শুরু হয়ে গেছে। সত্তর দশকের মত ৮০-তে অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল না, কিন্তু ছিল চোখরাঙানি, মুখব্যাঁকানি।

আর তাই যে যখন ক্ষমতায়, সেই তখন গণতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন নয় যে, স্বাধীনতালাভের পরও আমরা স্বাধীন ছিলাম।
ছিলাম না।
কিন্তু এটা মনে বা মেনে নিতে পারেনি মানুষ। তাই আন্দোলন হয়েছে বারেবারে।

৭।
উনিশ শতক শুরুর আগের বছরে টিপু সুলতান সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যবরণ করেন।
মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন:
এই পতাকা স্বাধীনতার পতাকা। এই পতাকা কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ তুলে নেবে।
১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়।
তারপর ইংরেজদের দুটি বিদ্রোহের মুখোমুখি পড়তে হয়।
একটি তামিলনাড়ুর টিনেভেলি-তে পোলিগার বিদ্রোহ। অন্যটি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এই বাংলার মেদিনীপুরের কাঁথির কোম্পানি কুঠিতে মালঙ্গিরা দাবিদাওয়া পেশ করে। মালঙ্গীরা সশস্ত্র ছিলেন না। উনিশ শতকে বাংলার প্রথম প্রতিবাদ এটি।
চার বছর পর আবার বিদ্রোহ। অবিভক্ত বাংলায়।বর্তমান ওড়িশার খুরদা বিদ্রোহ। আর এই বছরেই কাঁথির ক্ষুব্ধ মলঙ্গিরা ইংরেজ লবণ এজেন্টের কাছারি ঘেরাও করে।
১৮০০ খ্রিস্টাব্দে টিপু সুলতানের পরাজয়ের এক বছর পূর্তিতে ইংরেজরা ৪ মে তারিখেই ফোর্ট উইলয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয়দের ভাষা শিখে ভারতীয়দের আরো দক্ষতার সঙ্গে শাসন ও শোষণ করবে বলে। ফোর্ট উইলয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যতটা মাতামাতি করি, কাঁথির মলঙ্গি বিদ্রোহ বা খুরদা বিদ্রোহ নিয়ে ঠিক ততটাই উদাসীন। উড়িয়ারা অনেক বেশি সাহসী ভূমিকা পালন করেছে, বাঙালিদের তুলনায়।
এই সময় জঙ্গলমহলকে বের করে নেওয়া হল মেদিনীাপুর থেকে কিন্তু কোন প্রতিবাদ হল না।
১৮১২ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি বিদ্রোহ করল ময়মনসিংহে। বাঙালি কৃষক মাথা নত করেনি। কিন্তু সেই বিদ্রোহের ৩০০ বছরে কোনো উচ্চবাচ্য নেই --দুই বাংলায়।

১৮১৬ তে হল নায়েক বিদ্রোহ। উদাসীন আমরা।
১৮১৮ -তে মৌলবী হাজি শরিয়তুল্লাহের নেতৃত্বে ফরাজি বিদ্রোহের ঢেউ সাড়া তুলল প্রতিবাদী মনে। কিন্তু কলকাতার বাবুসমাজ উদাসীন। বেদান্ত নিয়ে বিতর্কে ব্যস্ত কলকাতা। সে বছর বের হল বাংলার তিন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র। বেঙ্গল গেজেটি, দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ।
বেঙ্গল গেজেটি বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কি লিখেছিল, আদৌ কি কিছু লিখেছিল --জানতে ইচ্ছে করে। বহু বছর পর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এই বিদ্রোহের পটভূমিতে লিখলেন ‘অলীক মানুষ’।
৮।

নীল চাষ আইন সিদ্ধ হল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। ধানের জমিতে জোর করে শুরু হল নীল চাষ। কৃষক মনে অসন্তোষ। কিন্তু তাকে ভাষা দেবে কে? বাংলার 'আধুনিক পুরুষ' বলে খ্যাত রামমোহন এবং তাঁর সুহৃদ দ্বারকানাথ নীলচাষের পক্ষে।

তবু বিদ্রোহ হল, হল বাংলাদেশের সন্দ্বীপে। ১৮২০-তে ছোটনাগপুরে বিদ্রোহ করলেন কোল জাতির মানুষেরা।

১৮২৩-এ মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকোচনের চেষ্টা হল। এবার রামমোহন তাঁর প্রতিবাদে সরব হলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধ এই প্রথম প্রকাশ্যে মুখ খুলল মধ্যবিত্ত বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

আর ১৮২৪-এ বারাকপুরে হল দেশের সিপাহিদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ। প্রথম বিদ্রোহ হয়েছিল ভেলোরে। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে।টিপু সুলতানের পরিবারের সদস্যরা লড়াকু ভূমিকা পালন করেন, এই বিদ্রোহে। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় হল ব্যারাকপুরে। ৩০ অক্টোবর, ১৮২৪।

এ বছরেই শুরু হল ঐতিহাসিক ওয়াহাবি ও ফরাজি বিদ্রোহ। ১৮২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে গারো বিদ্রোহে উত্তাল হল পূর্ব বাংলা। নেতৃত্ব দিলেন পাগলপন্থী টিপু। ১৮২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দেই আসামে আবার সিপাহি বিদ্রোহ। ১৮২৭-এ টিপু-কে গ্রেপ্তার করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল। এই সময়ে প্রতিবাদে বাধ্য হল বাংলার জমিদাররা। নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছিল। জন্ম ভূমধ্যধিকারী সভার। ১৮২৮-এই রামমোহন প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৮-এই ডিরোজিও-কে তাড়িয়ে দেওয়া হল হিন্দু কলেজ থেকে।

পরের বছর ১৮২৯-এ সতীদাহ প্রথা রদ হল।

আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটালেন ডিরোজিও। বীর ডিরোজিও-বিদ্রোহী ডিরোজিও--কলকাতা ময়দানে অক্টোরলনি মনুমেন্টের ওপর তাঁর ছাত্র অনুগামীদের নিয়ে তুললেন ফরাসি বিপ্লবের নীল সাদা লাল পতাকা। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা-র বাণী শোনালেন মানুষকে।

প্রসঙ্গত, ডিরোজিও-ই প্রথম স্বাধীনতার আকাঙ্খা জানিয়ে কবিতা লিখেছিলেন।

ডিরোজিও-র সঙ্গে কোন যোগ ছিল না তিতুমিরের। কিন্তু তিনি তুললেন স্বাধীনতার আওয়াজ। ১৮৩১-এ। ওয়াহাবি আন্দোলন ঝড় তুলল দেশে। কিন্তু বাংলার মূল সাহিত্যে এর স্থান হয়নি। ছড়া গান গীতিকায় অমর হলেন তিতুমির। শিক্ষিত বাঙালি উদাসীন। বাঁশের কেল্লা গড়ে, লড়ে নিহত হলেন তিতুমির। মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল তাঁর তিন শতাধিক সঙ্গীকে। কিন্তু দু:খের বিষয়, যত বেশি মানুষ ক্ষুদিরাম বা প্রফুল্ল চাকির নাম জানে, তত মানুষ কি জানেন তিতুমিরের নাম?

ইতিমধ্যে ১৮৩০ থেকেই শুরু হয়ে গেছে নীল বিদ্রোহ।

১৮৩২-এ মুন্ডা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে ভগৎ সিংকে ফাঁসি দিল ব্রিটিশরা। মুন্ডা বিদ্রোহের পাশাপাশি পূর্ব বঙ্গের দিনাজপুরে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেন। সে বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হল ইংরেজরা। কারণ সামরিক অস্ত্র বেশি ইংরেজদের। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন জিতু ও ছোটকা নামে দুই বীর। তাঁরা নিহত হন।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঘটল দুটি বড় ঘটল।

এক. আবার পাগলাপন্থী গারো বিদ্রোহ হল ময়মনসিংহে।

আর এ বছর-ই ইংরেজরা জমির মালিকানা পেল ভারতে। এর জন্য ওকালতি করেছিলেন রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। এর আগে ইংরেজরা এদেশে জমি কিনতে পারত না।

বিহারে ভূমিজ বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৩৩-এ। চালু হয় ভারত নিয়ন্ত্রণ বিধি।

৯।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন একজন স্বপ্নদর্শী মানুষ। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে। মূলত তাঁর উদ্যোগে ১৮৩৩-এ স্থাপিত হয় বিশ্ব প্রেমোদ্দীপনা সভা। বিশ্ব প্রেম জাগলেও ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাঙালিদের মধ্যে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি প্রেম ততখানি জাগেনি।
তাই ১৮৫৩ এর ৪ জানুয়ারি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রকাশের আগে সেভাবে কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করেননি তেমন কেউ। ব্যতিক্রম অক্ষয়কুমার দত্ত।
তবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে সরব হোন ডিরোজিও-র ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক। আর নিজেদের স্বার্থে ১৮৩৪-র ১ জানুয়ারি সরব হলেন জমিদাররা। চাপান হল ঋণের বোঝা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির।
এর প্রতিবাদে টাউন হলের সভায় যোগ দিলেন বহু গণ্যমান মানুষ।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ-ভাষা প্রবেশিকা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ ও দেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতেন এই সংগঠনের সদস্যরা। এই সময়ে নিষ্কর জমিতে কর বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় কোম্পানি। তাঁর প্রতিবাদ করা হয়।
১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আদালতের ভাষা হল ইংরেজি। ফার্সি গেল উঠে। এই ফলে জয়রাম মোক্তারদের মত বহু মানুষ বিপদে পড়েন। 'আদরিনী' গল্পে তাঁর সাক্ষ্য আছে।

এর দু বছর আগে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলে মিনিটস রচিত হয়। মেকলের সুপারিশে ইংরেজ মারফৎ শিক্ষার সুপারিশ করা হল। দেশের প্রচলিত শিক্ষার ধারার সাড়ে সর্বনাশের ব্যবস্থা হল। মেকলের মনে হয়েছিল, বাঙালি পুরুষরা মেয়েলি আর অনুকরণপ্রিয়। মেকলে চেয়েছিলেন, নতুন শিক্ষার ধারায় যে সব মানুষ বের হবে তাঁরা চিন্তায় হবে ইংরেজের ধ্বজাধারী আর দেহে বাঙালি। ভারতীয়দের সম্পর্কে কোনো শ্রদ্ধাই তাঁর ছিল না। মেকলে মনে করতেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতীয়রা যে কোন হীন কাজ করতে পারে।
সে ধারণা যে খুব অমূলক ছিল তা বলা যায় না।

তার প্রমাণ পাওয়া যায়, শিক্ষিত ভারতীয়দের কাজকর্মে। একটা বড় অংশ-ই সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে খেটে খাওয়া মানুষের পাশে তো দাঁড়ায়নি, উল্টে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

This document was created using SmartPDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

উনিশ শতক জুড়ে যে সব বিদ্রোহ, লড়াই হয়েছে তাতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষরা অংশ প্রায় নেয়নি বললেই চলে।
ব্যতিক্রম যদি কেউ দেখান খুশি হব।

আর পাঠক লক্ষ্য করবেন ১৮৫৭-য় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পরিধি ও ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার পর, বাংলায় সশস্ত্র বিদ্রোহের সংখ্যা কমেছে। খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনে নেতৃত্ব দান কমেছে। তার জায়গা নিয়েছে আপোষকামী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়।
তারা ততটুকুই আন্দোলন করেছে যতটুকু তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বিঘ্নিত না করেছে।
শিক্ষার সংস্কার, চাকরির মোহ, বাড়ি-জমি-অর্থের প্রতি গোপন সামন্ততান্ত্রিক টান তাঁদের নেতৃত্বের সীমাকে সীমায়িত করেছে, একই সঙ্গে বাংলা বাঙালির সর্বনাশ করেছে।

আর সংবাদপত্রের বিস্তার আপাত দৃষ্টিতে উপকার করলেও মেহনতি মানুষের হাত থেকে আন্দোলনের রাশ মধ্যবিত্তের হাতে ঠেলে দিয়েছে।

১০।
সিপাহি বিদ্রোহে বাঙালি বুদ্ধিজীবী দূরে থাক, বাঙালি মধ্যবিত্ত নেই। তখনকার বাঙালি সমাজের যারা মুখ্য পুরুষ, তাঁদের অন্যতম রাজনারায়ণ বসু এ বিষয়ে চমৎকার লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী ‘আত্মপরিচয়ে’।
মেদিনীপুর শহরে তখন চাকরি করতেন রাজনারায়ণ বসু। জিলা স্কুলে।
চাকরি রক্ষার জন্য বাইরে পেন্টুল আর ভিতরে সিপাহিরা যদি চলে আসে সেই ভয়ে পেন্টুলের তলায় ধুতি পরতেন। কারণ জনশ্রুতি ছিল, পেন্টুল দেখলে সিপাহিরা নাকি পেটাত।
বাঙালি বুদ্ধিজীবী এই দোলাচল থেকে আজো মুক্ত হতে পারেনি। তার শ্যাম (স্যাম-ও) রাখি না কুল রাখি দশা।
১১।
শিক্ষা গ্রহণ না করে বাঙালি মধ্যবিত্তের উপায় নেই। কিন্তু এই শিক্ষা যেন তাকে দাসে রূপান্তরিত না করে।
অনুকরণপ্রিয় নিজস্বতাহীন আপোসকামী যেন না হয় তার শিক্ষা।
কাউকে ক্ষমতায় আনা বা কাউকে ক্ষমতা থেকে ফেলা যেন তার একমাত্র দায় না হয়।

This document was created using SmartPDFCreator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com